মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে

আমাদের ছাত্রজীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল "অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর" এই নীতিকথা দিয়ে। পরবর্তীকালে হলো "অজগরটি আসছে তেড়ে"। এই অজগরের বিষবাষ্প ছড়িয়ে গেছে সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষার মানের ঘটেছে অবনতি। এই অবনতি প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র। গত ৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাদের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটছে শিক্ষার অবনতি। এই অবনতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষালাভ করেও শিক্ষার্থীরা দেশে কিংবা বিদেশে চাকরির মেধাগত দক্ষতা দেখাতে পারছে না। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরে বাড়ছে নকলপ্রবণতা ও পাবলিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর উচ্চহার।

এই জগদ্দল পাথরের বাধা একদিনে হয়ত অপসারিত করা যাবে না। কিন্তু তার কাজ শুরু করা চাই এখন থেকেই। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে, এটাই এ মুহূর্তে আশার কথা।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রবর্তন এবং সার্বিক শিক্ষার প্রসার সাধনই জাতীয় প্রগতির প্রকৃত মাপকাঠি। দেশের সার্বিক কল্যাণে শিক্ষার যে বিরাট গুরুত্ব আছে, সে কথা অনস্বীকার্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠন করেছে সেকেন্ডারি সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।

১৯৪৭ সালে প্রথম বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন সিলেবাসকে বিশেষভাবে উন্নীত করার প্রস্তাব রাখে, যাতে অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশের সমকক্ষতা অর্জন করা যায়। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো মেধার চর্চা। ডিরোজির শিক্ষানীতি ছিল "শিক্ষার্থীদের পড়ার ভারে জর্জরিত না করে বৃহৎ এবং উদারনৈতিক চিন্তাচেতনার বীজ তাদের মধ্যে রোপণ করা"। ডিরোজির শিক্ষানীতি সম্পর্কিত উক্তির সাথে সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক চাই।

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই দেয়া হয়, সাথে বিদ্যালয় কর্তৃক দেয়া হয় একাধিক সহায়ক পুস্তক। বিদ্যালয় থেকে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের জন্য দেয়া থাকে পাঠপরিকল্পনা। পাঠপরিকল্পনা শিক্ষার্থীর বয়স, মেধার সাথে অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ফলে শিক্ষার্থী হয়ে পড়ে মুখস্থনির্ভর। পাঠের প্রতি আগ্রহ এবং আনন্দ থাকে না। বাংলা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই। যেমন তৃতীয় শ্রেণীতে দেয়া হলো ব্যাকরণের কঠিন অধ্যায় কারক, সমাস। এই অধ্যায়কে সে কিভাবে গ্রহণ করবে– কিংবা রচনা লিখ? ঘোড়া। শিক্ষার্থীর পরিচিত বিষয়ই পাঠের বিষয় হলে তাদের সৃজনশীলতা সৃষ্টি হবে। বাংলা চিঠি লিখ, তাও যদি নির্দিষ্ট থাকে তাহলে মুখস্থবিদ্যার বাইরে সে বেরিয়ে আসবে কিভাবে!

এবার আসি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকে। সেখানেও রয়েছে নানা বিভ্রান্তি। যেমন–৫ম শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে বিজ্ঞ এবং জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কি খুব সহজ? ষষ্ঠ শ্রেণীতে রয়েছে "নোলক" রূপকধর্মী কবিতা। রূপকধর্মী কবিতা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মেধার পরিপন্থী। এই শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবইয়ের ১৬টি গদ্যের মধ্যে ১১টি বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক। সাহিত্যে আনন্দই যেখানে প্রধান ভূমিকা নেয়, বিজ্ঞান বা সমাজের প্রয়োজনের কথা সেখানে গৌণ হয়ে দেখা দেয়। ৯ম শ্রেণীতে জয়যাত্রা, অভিযাত্রিক, পূর্বাশার আলো তিনটি কবিতার মূল বক্তব্য প্রায় একই। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের রস আস্বাদনে হচ্ছে বঞ্চিত। আমার জানা মতে, প্রাথমিক স্তরে সহায়ক বই দেবার নিয়ম নেই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই নিয়ম পালিত হচ্ছে। বোর্ডের বইগুলোতে ব্যাকরণ পাঠও সন্নিবেশিত থাকে, তা হয়ত আমরা খেয়াল করি না। পাঠ্যপুস্তককেই যদি শিক্ষার বাহন বলে বিবেচনা করা হয়, তা হলে শিক্ষকের প্রাণবন্ত কথার আর বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। পাঠ্যপুস্তক যত কম হবে, ছাত্র-শিক্ষকের পক্ষে ততই মঙ্গল।

ছেলেমেয়েরা গাদা গাদা পুস্তকের বোঝা বয়ে বিদ্যালয় যাচ্ছে, এই শোচনীয় দৃশ্য থেকে মুক্তি দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "আমাদের জাতীয় জীবনে আজ বড় প্রয়োজন মানুষ বানানো শিক্ষা– যা শিক্ষা জীবনের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে। তাই শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উদ্দেশ্য যদি লক্ষ্যহীন হয় তবে তাতে আদর্শ থাকতে পারে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করলাম।

(১) শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ১০০% নিশ্চিত করতে হবে, (২) পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে, (৩) পাঠ্য পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন এবং বয়স ও মেধার ভিত্তিতে হতে হবে, (৪) শিক্ষককে দায়িত্বসচেতন হতে হবে, (৫) প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং অকৃতকার্য বিষয়ের জন্য পাঠদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ, (৬) প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক একটি টিমওয়ার্ক ভিত্তিতে কাজ করবেন, (৭) বাড়ির কাজ ও ক্লাস টেস্ট নেয়া যেতে পারে, (৮) ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।

সবশেষে আমি বলব, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার নামে জ্ঞানের যে বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, শিক্ষার্থীর কাছে তা মনে হচ্ছে কঠিন। স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ ফেলছে হারিয়ে, সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। পরীক্ষার হলে নকল ঠেকাতে পারব না, যদি না আমরা বিদ্যালয়ে তার মূল্যবোধ সৃষ্টি করে দিতে পারি। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে, নকলে সহায়তাদানের জন্য শিক্ষকের গায়ে কলঙ্কের যে লেপন হয়েছে, তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। এক দিন এ দেশের শিক্ষার্থীরা নকলের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। হয়ত এ দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষকের সুনির্দিষ্ট পথ বেয়ে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

আফিয়া খাতুন

সহশিক্ষয়িত্রী, মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।